একক ২৬ ❐ বাংলা ভাষার বিবর্তন

গঠন

২৬.১ উদ্দেশ্য

২৬.২ প্রস্তাবনা

২৬.৩ বাংলা ভাষার বিবর্তন

২৬.৩.১ বাংলা ভাষার কালবিভাজন

২৬.৪ প্রাচীন বাংলা ভাষার লক্ষণ

২৬.৫ মধ্য বাংলার সাধারণ লক্ষণ

২৬.৫.১ অন্ত্য-মধ্য বাংলার বৈশিষ্ট্য

২৬.৬ আধুনিক বাংলার লক্ষণ

২৬.৭ সারাংশ

২৬.৮ উত্তরমালা

২৬.৯ গ্রন্থপঞ্জি

২৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলার বিবর্তন তথা পরিবর্তনের ধারাগুলি সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- গত হাজার বছরের বেশি সময় ধরে বাংলা ভাষায় যে পরিবর্তন ঘটেছে এবং বাংলা ভাষা আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেছে বর্তমান অধ্যায়ে সংক্ষেপে তার একটি সার্বিক পরিচয় পাবেন।

২৬.২ প্রস্তাবনা

চর্যাপদ-এর সময় থেকে আধুনিক কাল—এই দীর্ঘ সময় নানান পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষা যেভাবে বর্তমান রূপে পৌঁছেছে তার পরিচয় দেওয়াই বর্তমান এককের লক্ষ্য।

২৬.৩ বাংলা ভাষার বিবর্তন

২৬.৩.১ বাংলা ভাষার কালবিভাজন

উনিশশো সাত সালে নেপালের রাজদরবার লাইব্রেরী থেকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচনা 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা 'চর্যাপদ'-এর পুথি উদ্ধার করে প্রকাশ করলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই। রচনাকাল আনুমানিক দশম শতাব্দী বা তার অল্প কিছু পরে। বাংলা ভাষার আদিপর্বকে এই আবিষ্কারের ফলে নতুন করে চেনা গেল। কীভাবে এর বিবর্তনটি ঘটেছে সে সম্পর্কে উৎসাহী গৌড়জন নিশ্চিন্ত হলেন।

প্রাচীন বাংলার প্রধান নিদর্শন আমরা পেয়েছি বৌদ্ধ সাধকদের 'চর্যাপদ'-এ, এছাড়া আছে বৌদ্ধ কবি ধর্মদাস-এর 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন' কাব্যের কয়েকটি শ্লোক এবং 'সেক শুভোদয়া'-য় সংকলিত কিছু গান এবং ছড়া। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা সর্বানন্দ-এর 'টীকাসর্বস্ব' (অমরকোষ-এর ব্যাখ্যা) গ্রন্থে প্রায় চারশো'র বেশি বাংলা, আধা সংস্কৃত, তদ্ভব এবং দেশি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কিছু ভূমিদান পত্র বা শিলাপটের কথাও উল্লেখ করবার মতো। প্রথম পর্বের বাংলা ভাষার উদাহরণ এগুলির মধ্যেই রয়েছে। সময়সীমা আনুমানিক অথবা কমবেশি ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। পরের একশো বছরকে (অর্থাৎ ১২০০ থেকে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ) বলা হয়েছে সন্ধিপর্ব।

মধ্যপর্বের বাংলা ভাষার দুটি পর্যায়—(এক) আদি-মধ্য এবং (দুই) অন্ত্য-মধ্য। শেষ পর্যায়ের স্থিতি ১৫০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ। ড. সুকুমার সেন-এর মতে শুধু ভাষার পরিবর্তনের কথা ভাবলে অন্ত্য-মধ্য উপস্তরের সীমা ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধরাই ঠিক হবে। তবে এর সঙ্গে সাহিত্যিক ব্যবহারের দিক লক্ষ্য রাখলে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়সীমা বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে।

২৬.৪ প্রাচীন বাংলা ভাষার লক্ষণ

সাধারণভাবে লক্ষণগুলি হ'ল এইরকম ঃ

এক। চর্যাপদ-এর ভাষায় স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জণবর্ণের ধ্বনিগত বিশিষ্টতা আধুনিক বাংলার মতোই। তবে সংস্কৃত বানানগুলির প্রয়োগ বা ব্যবহারে বিচ্যুতি আছে। যেমন সবর/শবর, পানি/পানী। এই একই ধরনের বিচ্যুতি আছে শ, ষ, স-এর প্রয়োগেও। ন, ণ সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য। যেমন বলা চলে অ, ই এবং এ-কারের আপাত বিশৃঙ্খলা সম্পর্কেও। বানান বিভ্রাট ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটেনি, ঘটেছে অসতর্কতা বা অজ্ঞতার জন্য। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় ডুম্বী, ডোম্বী যেমন আছে তেমনি ডোম্বি, শবরি বানানও আছে।

দুই। সমীভূত যুগ্মব্যঞ্জন সরল হয়েছে। সেই সঙ্গে পূর্ববর্তী হ্রস্বধ্বনি হয়েছে দীর্ঘ। এই দীর্ঘতা অবশ্য লেখায় নেই। যেসব ব্যঞ্জনের সঙ্গে ঙ, ঞ, ণ, ম যুক্ত থাকত তাদের পূর্বস্বর দীর্ঘ হত। সেগুলি লুপ্তপ্রায় হয়ে তাদের জায়গায় সানুনাসিক স্বরধ্বনি এসে গেল। যেমন 'ধর্ম' হয়েছে 'ধাম',

'জন্ম'—'জাম', 'মাধ্যন'—'মাঝেঁ' প্রভৃতি। এর ব্যতিক্রম রয়েছে অর্ধতৎসম শব্দে। সেখানে যুক্তব্যঞ্জন থেকে গেছে। যেমন 'দুর্লক্ষ্য' থেকে আসা 'দুলক্খ', 'মিথ্যা' থেকে জাত 'মিছা'।

তিন। ক্রিয়াপদের শেষে 'অ' লুপ্ত হয়েছে। 'উট্ঠিঅ' হয়েছি 'উঠি'। কিন্তু মূল বিশেষণপদ যখন ক্রিয়াপদে রূপান্তরিত হয়েছে, তখন তার শেষে 'অ' থেকে গেছে। লুপ্ত হয়নি। যেমন 'করিঅ', 'জ্বলিঅ' প্রভৃতি। আদিতে এগুলি 'কৃত', 'জ্বলিত' এই অর্থপ্রকাশক পদ ছিল।

চার। র-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতির ব্যবহার লক্ষণীয়। পাঁচ, সাত বা বত্রিশ সংখ্যক চর্যায় 'নি অড়ি' 'নিয়ড়ি' পদে এবং এগার সংখ্যক চর্যায় 'ন আড়ি' পদে য়-শ্রুতির উদাহরণ আছে। এইরকম ব-শ্রুতির উদাহরণ রয়েছে বারো সংখ্যক পদের 'নওবল', আঠারো সংখ্যক পদের 'ভুঅন' এবং দশ সংখ্যক চর্যার 'নাবেঁ' পদে। এই 'নাবেঁ' রূপান্তরিত হয়েছে 'নাএঁ-তে।

পাঁচ। এর, অর এবং র বিভক্তির সাহায্যে ষষ্ঠীর পদ সম্পন্ন করা হত। চর্যায় আছে 'রুহের তেন্তলি' অর্থাৎ গাছের তেঁতুল বা 'ডোম্বী-এর সঙ্গো' অর্থাৎ 'ডোম্নীর সঙ্গো'। ষষ্ঠী বিভক্তির পদ বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল। যেমন, 'তোহোরি কুড়িয়া' বা 'হানেরি মালী'। পুরোনো ষষ্ঠীর পদও আছে। দৃষ্টান্ত—'ক্ষণস্য' থেকে 'খণহ', 'যস্য' থেকে 'জাহ'।

ছয়। কে, কে রে বিভক্তি দিয়ে গৌণকর্ম ও সম্প্রদানের পদ সাধিত হত। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় 'নাশক' অর্থাৎ নাশের জন্য, 'বাহবকে পারই' বা বাইতে পারে, 'কেহ কেহ তোহোরে বিরুআ বোলই' অর্থাৎ কেউ কেউ তোকে বিরূপ বলে।

সাত। ই, এ, হি, তে—সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ। এই ধারায় 'গৃহকে' থেকে এসেছে 'ধরে', 'হৃদয়াভিঃ' অথবা 'হৃদয়ধি' থেকে এসেছে 'হিঅহি'।

আট। রূপে এবং প্রয়োগে করণের সঙ্গো মিল থাকায় সপ্তমীতে কোনো কোনো সময় 'এঁ' বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়—যেখানে ঐ 'এঁ' বিভক্তি মূলত তৃতীয়ারই চিহ্ন। যেমন 'ঘরেঁ'।

নয়। প্রধানত অধিকরণ কারকই 'তির্যক কারক' (রূপতত্ত্বগত বিচারের নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় কারক দুটি—কর্তা বা মুখ্য কারক এবং **তির্যক বা গৌণ কারক।** প্রাচীন প্রথমা ও তৃতীয়া বিভক্তি মিশে গিয়ে তৈরি হয়েছে মুখ্য কারক, ষষ্ঠী সপ্তমী মিশে গিয়ে হয়েছে গৌণ কারক। অনুসর্গ এবং অনুসর্গ থেকে সৃষ্ট নতুন বিভক্তিগুলিও তির্যক বা গৌণ কারকে ব্যবহৃত হয়।) হওয়ায় অপাদানের অর্থে সপ্তমী বিভক্তির ব্যবহার এসে গেল। উদাহরণ 'জানে কাম কি কামে জান'—অর্থাৎ জন্ম থেকে কর্ম কি কর্ম থেকে জন্ম। অথবা, 'ডোম্বীতে আগলি নাহি ছিণালী' অর্থাৎ ডোম্নীর থেকে বড় ছিণাল আর কেউ নেই।

দশ। পঞ্চমীতে অপভ্রংশ-জাত 'হু' বিভক্তির প্রয়োগ দু'বার পাওয়া গেছে। এইভাবে 'ক্ষেপভ্যম' থেকে এসেছে 'খেপহু' ; 'র-াৎ' থেকে 'রঅণহুঁ'।

এগারো। তৃতীয়া বিভক্তি, 'এঁ' সংস্কৃতের 'এন' থেকে এর সৃষ্টি। 'বেগেন' হয়েছে 'বেগেঁ' 'গজবরেন—'গজবরেঁ',

'সন্ধানেন' হয়েছে 'সন্ধানে'। চর্যার প্রায় প্রত্যেক পদেই এরকম প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। সপ্তমীর সঙ্গে এক হওয়ায় তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন হিসেবে 'তেঁ', 'তে' বা 'এঁতে' বিভক্তির প্রয়োগও দেখা গেল। দৃষ্টান্ত ঃ 'সুখদুখেঁতে' (সুখদুঃখ + অন্ত + এন)

বারো। আক্ষে, তুক্ষে সংস্কৃতে বহুবচন বোঝাত। প্রাচীন বাংলায় এর একবচনে ব্যবহারও হয়েছে। অবশ্য 'অহকম্' শব্দজাত 'হউ' তখন পুরো লুপ্ত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 'আক্ষে দেহুঁ', অর্থাৎ আমি দিই। 'ময়েন' থেকে আসা 'মই' এবং 'ত্বয়েন' থেকে আসা 'তঁই' প্রধানত করণকারকের পদ। এখন তখন কেবল কর্মভাববাচ্যের কর্তা হিসেবেই চলিত ছিল। যেমন 'মই দেখিল'-এর উৎস সংস্কৃতের 'ময়া দৃষ্টম্'।

তেরো। কর্তৃকারক ছাড়া অন্যান্য কারকের অর্থে বিভিন্নপদ অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত। উদাহরণ ঃ 'তঁইবিনু'র মূল 'ত্বয়া বিনা', 'তোহোর অন্তরে', অর্থ হ'ল—'তোর তরে', 'অধরাতি ভর কমল বিকসিউ', অর্থ—আর্ধেক রাত ধরে কমল বিকশিত হ'ল। অনুরূপ দৃষ্টান্ত ঃ 'দিআঁ চঞ্চালী' অর্থ হ'ল—'চেঁচাড়ী দিয়ে'।

চৌদ্দ। ধাতুরূপের বর্তমান কালের উত্তমপুরুষে পেখমি, জাণমি, পুছমি ঃ করহুঁ, লেহুঁ, মধ্যম পুরুষে আইমসি, পুছসি, জানহ ; প্রথম পুরুষে পেখই, ভণই, চাহন্তি, কহন্তি, ভণসি, বোলসি প্রভৃতির প্রয়োগ চলিত ছিল।

পনেরো। অতীতকালে বোঝাতে প্রায় ক্ষেত্রেই 'হল' বা 'ল' এবং মধ্যম পুরুষে 'মি' 'ম' যুক্ত করা হত। উত্তম বা প্রথম পুরুষে 'ইল' বা 'ল' সাধারণভাবে নির্বিচারে ব্যবহার করা হত। যেমন 'মই দেখিল' বা 'শবরী দিল' ; 'লা' বা 'লী' যোগ করে 'বাট রুন্ধেলা', 'সোনে ভরিলী'। মধ্যম পুরুষে আছে 'অছিলেস', 'নিলেসি'।

ষোল। ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগ বোঝাতে 'ইব', 'মি'—চলিত ছিল। যেমন 'করিব নিরাস', 'মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ'। মধ্যম পুরুষে যুক্ত হত 'বে', 'সি', যেমন 'যাইবে', 'মারিহসি', প্রথম পুরুষে ছিল 'ই'-এর প্রয়োগ। উদাহরণ ঃ 'করিহ', 'কহিহ' প্রভৃতি।

সতেরো। কর্মভাববাচ্যেও ক্রিয়াপদে অতীতকাল বোঝাতে 'ই', 'ইল' এবং ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে যুক্ত হ'ত 'ইব' বিভক্তি। ক্রিয়া যদি সকর্মক হত, তাহলে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি যুক্ত হত। অকর্মক হলে প্রথমা বিভক্তি। এইরকম ক্রিয়াপদ সাধারণভাবে কর্তৃপদের বিশেষণ হিসেবেই বিবেচিত হত। অর্থাৎ কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হলে ক্রিয়াপদেও লাগত স্ত্রীপ্রত্যয়। যেমন 'চলিল কাহ্ন'—এর মূল হল 'কৃষ্ণঃ চলিতঃ'। অনুরূপভাবে 'অগ্নিকা লগ্না' থেকে 'লাগেলি আগ্নি'। ভাববচন (Abstract Noun) পদের সঙ্গে 'যা' ধাতুর পদ যৌগিক কর্মভাববাচ্য চলিত হয়েছিল। যেমন 'ধরণং ন জাতি' থেকে চর্যাপদের 'ধরণ এ যাই'।

আঠারো। শব্দরূপের প্রকাশে একবচন এবং বহুবচনের কোনো পার্থক্য ছিল না। বহুবচন বোঝাতে 'সকল',

'লোক', 'জাল', 'গণ' প্রভৃতি বহুত্বজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হত। উদাহরণ ঃ 'পণ্ডিত লোঅ', অর্থাৎ পণ্ডিত লোকেরা, 'জোইনি জাল' অর্থাৎ যোগিনীরা। অনুরূপভাবে 'সকল সমাহিঅ' অর্থাৎ সকল সমাধির দ্বারা।

উনিশ। সংস্কৃত অনুসারী সমাসবদ্ধ পদও বাংলায় ছিল যথেষ্ট। যেমন 'কমলরস', 'মহাবরু', 'মোহতরু', 'কায়াতরুবর' প্রভৃতি। সংখ্যা বোঝায় এমন শব্দের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা সর্বানন্দ-এর 'টীকাসর্বস্ব' (অমরকোষ-এর টীকা) গ্রন্থে বেশ কিছু বাংলা তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম ও দেশি শব্দ পাওয়া গেছে। যেমন 'তির্যক' থেকে আসা 'টেরা', 'পরস্ব' থেকে আসা 'পরশু'। অনুরূপভাবে 'ঝম্পান', 'তেলাকোন', 'পিম্পড়ি' প্রভৃতি।

রাজকীয় ভূমিদান পত্রেও কিছু দেশীয় নাম পাওয়া যায়। যেমন 'চবটি গ্রাম' (চট্টগ্রাম), 'কণামোটিকা' (কানামুড়ি), 'নড্‌জোলি' (নাড়াজোল) ইত্যাদি। কিছু কিছু খাঁটি বাংলা শব্দও এসব ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন আঢ়া, খিল, জাঙাল, নাল, বরজ, গাড্ডা প্রভৃতি।

অনেকেরই দাবি হ'ল যে চর্যাপদ-এর ভাষা নাকি হিন্দীরই প্রাচীন রূপ। এ সম্পর্কে সুনীতিকুমার প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদের অভিমত হল যে চর্যাপদাবলীর এমন বেশ কিছু শব্দ বা বাক্ বিধির ব্যবহার আছে যার সঙ্গো আধুনিক বাংলার বিশেষ রীতি বা প্রকাশভঙ্গির মিল অত্যন্ত স্পষ্ট। 'তা দেখি', 'জে জে আইলা তে তে গেলা', 'সরি পড়িআঁ', 'থির করি', 'দুহিলা দুধু', 'গুনিয়া লেহুঁ' প্রভৃতি এই সমস্ত প্রয়োগবিধির দৃষ্টান্ত। প্রাচীন বাংলায় প্রবাদ বাক্যের সংখ্যাল্পতা ছিল না। এছাড়াও 'ইল' প্রত্যয়ের দ্বারা ক্রিয়ার অতীতকাল এবং 'ইব' প্রত্যয় দিয়ে ভবিষ্যৎকাল বোঝানোর ব্যাপারেও নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় যে চর্যাপদ-এর ভাষা প্রাচীন বাংলা ভাষারই নিদর্শন।

২৬.৫ মধ্য বাংলার সাধারণ লক্ষণ

সামগ্রিকভাবে মধ্য বাংলার সময়সীমা আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এর উপস্তর দুটি। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আদি মধ্যস্তর ; ১৫০০ থেকে ১৭৫০ বা আরও একটু বাড়িয়ে ধরলে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ—অন্ত্য মধ্যস্তরের সীমা। প্রথম স্তরের ভাষার পরিচয় রয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং তার সমসাময়িক কিছু মঙ্গালকাব্য, ভাগবতের অনুবাদে। কৃত্তিবাসী রামায়ণক্ষেত্র ধরা যায়। তবে সেখানে এত প্রক্ষেপ ঘটেছে যে আদি নিদর্শন নেই বললেই হয়। পরবর্তী স্তরের ভাষায় দৃষ্টান্ত পর্যাপ্ত। তার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী, সমসাময়িক মঙ্গালকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, চট্টগ্রামের মুসলমানী সাহিত্য, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সবই পড়ে।

আদি মধ্যস্তরের বাংলা ভাষার বিশিষ্টতা বা সাধারণ লক্ষণগুলি হল ঃ

এক। আ-কারের পরে অবস্থিত ই-কার, উ-কার ধ্বনির ক্ষীণতা এবং পাশাপাশি দু'টি স্বরধ্বনির অবস্থান। যেমন বড়াই—বড়াই ; আউলাইল—আউলইল।

দুই। মহাপ্রাণ নাসিক্যধ্বনির মহাপ্রাণতার ক্ষীণতা বা লুপ্তি। এইভাবে 'কাহ্ন' হয়েছে 'কান', 'আহ্মি' হয়েছে 'আমি'।

তিন। চর্যাপদে বহুবচন সৃষ্টিতে জাল, ভাগ, সমূহ, কূল প্রভৃতি যুক্ত হত। 'রা' শব্দ যোগে বহুবচনের ব্যবহার বা প্রয়োগ এই সময়ে শুরু হ'ল। যেমন, 'আক্ষারো', 'তোক্ষারা'।

চার। 'ইল' শেষে আছে এমন অতীতের এবং 'ইব' শেষে আছে এমন ভবিষ্যতের কর্তৃবাচ্যে ব্যবহার শুরু হ'ল। দৃষ্টান্ত ঃ 'মো শুনিলোঁ' (অর্থাৎ আমি শুনলাম), 'মো দেখিলোঁ, 'মো করিবোঁ', 'মো নাসিবোঁ' প্রভৃতি।

পাঁচ। প্রাচীন (ইঅ) বিকরণ সমন্বিত কর্মভাববাচ্য ক্রমশ অচলিত হয়ে এল। যৌগিক ভাবকর্মবাচ্য তৈরি হওয়াটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। বিশেষ করে 'যা' ও 'ভু'-ধাতুর সাহায্যে। যেমন ততকে মুঝাল গেল মোর মহাদানে', 'সে কথা কহিল নয়।'

ছয়। অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'আছ্' ধাতু যোগ করে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হল। যেমন—লই + আছে = লইছে, রহিল + আছে = রহিলছে।

সাত। আভিমুখ্য এবং প্রাতিমুখ্য বোঝাতে 'সিয়া' (অর্থাৎ এসে এবং গিয়া) যথাক্রমে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হত। যেমন ঃ দেখ সিয়া—দেখ সে, দেখ গিয়া—দেখ গে প্রভৃতি।

আট। চর্যায় ছন্দ ছিল মাত্রামূলক, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। ফলে ষোলো মাত্রার পাদাকুলক-পজ্ঝটিকা থেকে চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের বিকাশ ঘটল।

২৬.৫.১ অন্ত্য-মধ্য বাংলার বৈশিষ্ট্য

এক। অন্ত্যস্বরের লোপ (apocope) এবং মধ্যস্বরের লোপ প্রবণতার ফলে দ্বিমাত্রিকতা বা দ্ব্যক্ষরতা এসে গেল। পদের শেষে একক ব্যঞ্জনের পরের যে অ-কার তা লুপ্ত হ'ল। দৃষ্টান্ত—রাবণ, টোপর্, দাম্, ঘাম্, জল্, ভাত্ প্রভৃতি। ব্যতিক্রমও আছে। যেমন শক্ত, ভক্ত, গোবিন্দ প্রভৃতি। শুধু অন্ত্যস্বর নয়, মধ্যস্বরের লুপ্তিও একালের ভাষাকে সরল করে তুলেছে। যেমন—গাম্ছা, রান্না, অপ্রাজিত প্রভৃতি। ফলে দ্বিমাত্রিকতার ব্যবহার এসে যাওয়াও খুব স্বাভাবিক। তাই হয়েছে।

দুই। **অপিনিহিতি এবং তার পরবর্তী পর্যায়ের পরিবর্তন অভিশ্রুতি** এই পর্বেই দেখা দিল। এগুলি আধুনিক সময়ের ভাষারই বৈশিষ্ট্য। তবে তা দেখা দিয়েছে এই পর্বেই। বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবর্তনের ক্রমরেখাটি এইরকম ঃ

কালি—কাইল, চারি—চাইর, মারি—মাইর।

কালি—কাইল—কাল, বানিয়া—বন্যা—বেনে, আকুল—আউল—এলো, জলিয়া—জাল্যা—জোল প্রভৃতি।

অপিনিহিত বা বিপর্যস্ত উ হয়েছে ই ; পরে এই 'উ' ধ্বনিও লুপ্ত হয়েছে। যেমন 'ধাতু'—ধাউত—হয়েছে ঢেল। সন্ধি অথবা লুপ্তির পর অভিশ্রুতি হয়েছে। 'করিয়া' হয়েছে কইরা—ক'রা—কর্যা—কোরে। এইরকম খাইয়া—খেয়ে, পাত্তিয়া—পেতে।

তিন। সাধু এবং চলিত ভাষায় ঢ়, ন্হ ও ম্হ—এইসব মহাপ্রাণধ্বনির মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয়েছে। যেমন 'বুঢ়া' হয়েছে বুড়া, 'কাহ্ন'—কান, 'আহ্মর'—আমার, 'আহ্মি'—আমি।

চার। 'ইআ' হয়েছে এ্যা অথবা এ। 'উআ' হয়েছে 'ও'। যেমন 'বনিয়া' হয়েছে 'বন্যা', তার থেকে সৃষ্টি হয়েছে 'বেনে' শব্দটি। অনুরূপভাবে 'সাথুয়া' হয়েছে, সেথো, 'জালিয়া'—জেলে। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই পরিবর্তন অত্যন্ত স্পষ্ট।

পাঁচ। বিশেষ্য কর্তার বহুবচনে রা, নির্দেশক বহুবচনে 'গুলা', 'গুলি' বিভক্তি এবং তির্যক কারকের বহুবচনে 'দি', 'দিগ', 'দে' বিভক্তির প্রয়োগ সপ্তদশ শতাব্দীতেই দেখা দিয়েছিল।

ছয়। 'ইল', 'ইব' যথাক্রমে অতীতে ও ভবিষ্যতে সম্পূর্ণভাবে কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হতে লাগল। অতীতে এগুলি যুক্ত হত কর্মবাচ্যে। যেমন 'মই করিল', 'মুই করিলাঙ্', 'তেঁ করিব', 'সে করিবে' ইত্যাদি।

সাত। 'আছ' ধাতু যোগ করে যৌগিককালের ব্যাপক ব্যবহার দেখা গেল। যেমন 'আসিছি', 'আসিতেছে', 'আসিয়াছিল' প্রভৃতি।

আট। কোনো একটি বিশেষ ধাতু ব্যবহার না করে যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে—ক্রিয়ার অর্থপ্রকাশ পরবর্তীকালের সংস্কৃতের লক্ষণ। 'নৃত্যতি' ব্যবহার না করে 'নৃত্যং করোতি', 'গমনং করোতি', দর্শনং করোতি' প্রভৃতি হ'ল এর উদাহরণ। এই ব্যবহার অপভ্রষ্ট-অবহট্ঠের মধ্যে দিয়ে বাংলায় চলে এল। অন্ত্য-মধ্য পর্বের সাধু বাংলায় এর ব্যবহার অনেক তদ্ভব ধাতুকেও অচলিত করে দেয়। যেমন—ভ্রমণ করে, শ্রবণ করে প্রভৃতি। এমনকি পালি-পর্বে ব্যবহার শুরু হয়েছিল এমন সব নতুন বিকরণ দিয়ে ধাতুগুলি নতুন রূপ লাভ করে। সংস্কৃত 'জিনাতি' থেকে সৃষ্ট 'জিনা', 'জিনিল', 'জিনিবে'। 'উপবিশিতি'—'বসে', 'নিবর্ততে'—'নেওটা', 'বুলা' অর্থ চলে বেড়ানো, 'গোড্ড' এই দুই দেশি ধাতু থেকে এসেছে 'গোড়া' ; অর্থ হ'ল—পিছনে পিছনে যাওয়া, অনুগমন করা।

নয়। সংস্কৃত শব্দকে নামধাতু হিসেবে প্রয়োগের দৃষ্টান্তও আছে। যেমন 'নিমন্ত্রিয়া', 'কাতরিয়া', 'প্রণমিলা', 'অগ্রসরি', 'প্রবর্তিতে' প্রভৃতি।

দশ। প্রচুর পরিমাণে আরবি, ফারসি, কিছু তুর্কি এবং শেষদিকে পোর্তুগিজ শব্দও অন্ত্য-মধ্যস্তরের বাংলায় চলে এসেছে। কমবেশি আড়াই হাজারের মতো ফারসি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং স্বাভাবিক ভাবে।

এগারো। অবহট্ঠ এবং প্রাচীন মৈথিলী থেকে আসা ব্রজবুলি ভাষা এই পর্বের বাঙালি লেখকেরা রীতিমতো অনুশীলন করেছেন। চৈতন্য-পরবর্তী সময়ের বৈষ্ণব মহাজন কবিরা এ ব্যাপারে প্রকৃত সাফল্য দেখিয়েছেন। এই কৃত্রিম ভাষার অনুশীলন অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অসম এবং বাংলাদেশেই বেশি হয়েছে। এর সঙ্গে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট পদ এবং প্রয়োগও কিছু এসে গেছে।

বারো। অন্ত্য-মধ্য পর্বের বাংলা ভাষায় লিখিত এবং মুখের ভাষার মধ্যে তেমন কোনো রীতিসম্মত পার্থক্য ছিল না। এ দু'য়ের মিশ্রণ সকলেই মেনে নিয়েছিলেন।

২৫.৬ আধুনিক বাংলার লক্ষণ

আধুনিক বাংলার সূচনা মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্ব থেকে। এই সময় থেকেই সাহিত্যসৃষ্টিতে 'সাধু' ভাষার ব্যবহারও সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল।

সংক্ষেপে এই পর্বের ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হল ঃ

এক। লিখবার ভাষা মুখের ভাষা থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে সাধুভাষা হিসেবে সাহিত্যের একমাত্র বাক্‌রীতির আকার নিয়েছে। অন্ত-মধ্য পর্বের বাংলায় লিখবার ভাষা এবং কথ্য ভাষায় যে মিশ্রণ আমরা লক্ষ করেছি, এখন তা আর থাকল না।

দুই। অন্ত্য-মধ্য পর্বে অপিনিহিত স্বরধ্বনি অভিশ্রুত ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। স্বরসঙ্গতিও হয়েছে। যেমন 'হাটুয়া'—'হোটো', 'নাটুয়া'—'নেটো', 'মাধব'—'মেধো' প্রভৃতি। অপিনিহিতি না ঘটলেও পাশাপাশি অবস্থিত স্বর পরিণত হয়েছে একস্বরে। 'আকুল' হয়েছে 'এলো।' যেমন 'এলো কেশ'। এই পর্বে স্বরসঙ্গতি রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত। যেমন—জলো, গেছো, মেছো, পটো ইত্যাদি অজস্র দৃষ্টান্ত।

তিন। নিজন্ত ধাতুর অর্থ অনিজন্ত হয়ে গেছে। যেমন, 'পেলা', 'ফেলা' বা 'পৌঁছায়' প্রভৃতি ধাতু।

চার। সাধুভাষায় যুক্ত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। যেমন—দান করা, পান করা, আহার করা, উপবেশন করা, ভ্রমণ করা প্রভৃতি। নামধাতুর ব্যাপক প্রয়োগ সাধু এবং চলিত দুই ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে ঘটেছে।

পাঁচ। নঞর্থক 'ন' শব্দের প্রয়োগ প্রাচীন ও মধ্যপর্বের বাংলায় ক্রিয়াপদের আগে ছিল। যেমন 'আমার শপতি লাগে না যাইও ধেনুর আগে'। আধুনিক বাংলায় এর প্রয়োগ হ'ল ক্রিয়াপদের পরে। তবে কবিতায় পুরোনো রীতি একেবারে বাদ পড়েনি। মধুকবির কাব্যে এর বিশেষ প্রয়োগ আছে। সম্ভাবক ভাবেও পুরোনো প্রয়োগ বিদ্যমান। যেমন—'সে না শোনে, না শুনবে' বা 'না করল তো না করল বয়েই গেল'।

ছয়। সমাপিকা ক্রিয়ার পরিবর্তে অসমাপিকা ব্যবহার করে একাধিক বাক্যকে একটিমাত্র সরল বাক্যরূপে প্রকাশ। যেমন—রমেন সেখানে গেল। সে দেখল। সে অবাক হ'ল। এই তিনটে বাক্য না লিখে লেখা হল—'রমেন সেখানে গিয়ে দেখে অবাক হল।'

সাত। অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থে ভাববাচক শব্দের সঙ্গে 'পূর্বক' বা 'করতঃ' যোগ করে। যেমন—গমনপূর্বক, গমনকরতঃ, দর্শনপূর্বক, দর্শনকরতঃ প্রভৃতি।

আট। পদের ও বাক্যের সংযোগ সাধনে ফারসি অব্যয় 'ও' (ফারসি 'ব' জাত)-এর প্রয়োগ 'এবং'-এর সঙ্গেই রয়েছে। যেমন—'নারী ও পুরুষ', 'সে সেখানে গেল ও দেখল'। সংস্কৃত 'অপি' থেকে সৃষ্ট অব্যয় 'ও' শব্দের সঙ্গ—চলতে লাগল। যেমন সোহপি—সেও।

নয়। গদ্যরীতির প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা হ'ল। শুধু তাই নয় এর প্রসারে পুরনো পদ্যরীতি ম্লান হয়ে গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কিছু আগে থেকেই এর ফলে সাহিত্যের বোধ ও সীমা প্রসারিত হয়ে গেল।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা হ'ল এই পর্বেই। সাহিত্যিক গদ্যকারের অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। এর পলে আমাদের যে গদ্যের পত্তন হল তা অবশ্যই পণ্ডিতী রীতির। তৎসম শব্দের বাহুল্যও তাই এতটা। তবে এও বিশেষভাবে বলবার যে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে, সেই সূত্রে ব্যবসায়িক নানা প্রয়োজনে ওলন্দাজ (হল্যান্ডের অধিবাসী), ফরাসি ইত্যাদি জাতির সঙ্গে সংযোগ—সম্পর্ক নিবিড় হওয়ায় ইংরেজি সমেত বিভিন্ন ইয়োরোপীয় ভাষার শব্দ আইন-আদালত বা প্রশাসনিক কাজকর্মে বাংলায় গৃহীত হতে থাকল। কাজকর্মে ফারসি শব্দের ব্যবহার ক্রমেই কমে আসতে থাকল। সে জায়গায় ছায়া দীর্ঘ হ'ল ইংরেজি, শেষ পর্যন্ত তার প্রভাবই যেন একমাত্র। এর কারণ অবশ্য ইংরেজের রাজনৈতিক আধিপত্য। সেই সূত্রে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান।

২৬.৭ সারাংশ

প্রথমে বাংলা ভাষার কাল বিভাজন। চর্যাপদ-এর বাংলা ভাষা থেকে আরম্ভ করে আদি-মদ্য এবং অন্ত্য-মধ্য পর্বের বাংলা ভাষার নানান বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পরে রয়েছে আধুনিক বাংলা ভাষার বিবরণ, যার পরিণতিতে গদ্যভাষার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ।

২৬.৮ অনুশীলনী

১. নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) 'চর্যাপদ' ছাড়াও আর কোথাও কোথায় প্রাচীন বাংলার নিদর্শন আছে?

(খ) প্রাচীন বাংলায় অপাদানের অর্থে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ দিন।

(গ) 'চর্যাপদ' যে প্রাচীন বাংলাই তার অব্যর্থ লক্ষণ কী?

(ঘ) মধ্য বাংলার দুটি উপস্তরের উল্লেখ করুন।

(ঙ) আধুনিক বাংলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লক্ষণ কী?

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) প্রাচীন বাংলার অন্তত দশটি সাধারণ লক্ষণের পরিচয় দিন।

(খ) আদি মধ্যস্তরের বাংলা ভাষার বিশিষ্টতার দিকগুলি উল্লেখ করুন।

(গ) আধুনিক বাংলার সাধারণ লক্ষণগুলি আলোচনা করুন।

২৬.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।

২. ড. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত।

৩. ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য়)।

৪. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। (১ম ও ২য়)।

৫. ড. জীবন্দেু রায়—বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।